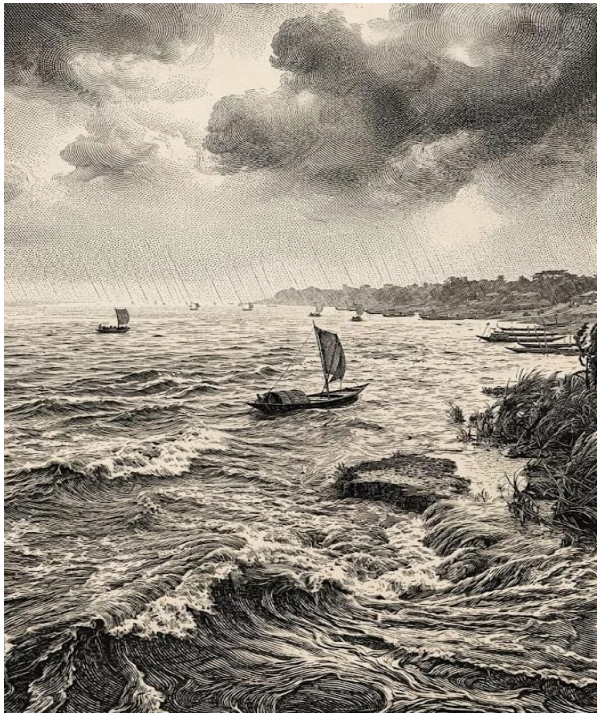
পদ্মা পাড়ের স্মৃতি

মোঃ নজরুল ইসলাম (বিপুল)



চেনা সুর প্রকাশনী
বই প্রকাশে বিশ্বস্ততার প্রতীক

পদ্মা পাড়ের স্মৃতি
মোঃ নজরুল ইসলাম (বিপুল)

প্রথম সংস্করণঃ ১৭ আষাঢ় ১৪৩৩ / ১ জুলাই ২০২৬ ইং
প্রকাশনায়ঃ চেনা সুর প্রকাশনী
প্রধান কার্যালয়ঃ জামিরদিয়া মাষ্টারবাড়ি, ভালুকা, ময়মনসিংহ।
শাখা অফিসঃ ২৮/১ রূপচাঁন লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইলঃ ০১৯৯১-১৫১৬৯২

প্রচ্ছদঃ জহির।
পরিবেশকঃ বই চত্বর পাবলিকেশন।
অনলাইন পরিবেশকঃ রকমারি ডট কম, ওয়াফিলাইফ ডট কম্

মুদ্রণ ও বাঁধাইঃ দি মোকাদ্দাস এন্ড ব্রাদার্স
২৮/১,রূপচাঁন লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মূল্য ২০০ টাকা
ISBN: ৯৭৮-৯৮৪-২৯৫৫৭-৬-১

"Memories of the Padma's Edge in Rajshahi" by **Md. Nazrul Islam Bipul**
Published by Chena sur prokashoni. Head Office: Jamirdia master bari, Valuka, Mymensingh. Branch Office: 28/1 Rupchand lean, Banglabazar Dhaka1100. Price 200 Taka To purchase online www.rokomari.com www.wafilife.com chenasurprokasoni@gmail.com ISBN: 978-984-29557-6-1

উৎসর্গ

রাজু আহমেদ বাবু (বাবু মামা)-এর তরে—

যিনি আমার ঘরছুট শৈশবকে শিখিয়েছিলেন জীবনের রুক্ষ পথে ‘জলের মতো’ বয়ে যেতে।

অসময়ে হারিয়ে যাওয়া আমার সেই প্রিয় পথপ্রদর্শক; তোমার আঙুল ধরে বেরিয়েছিলাম বলেই, আজ আমি একলা চলতে শিখেছি।



স্মৃতির জলছবি

স্মৃতি বড় অদ্ভুত এক ক্যানভাস। কখনো তা এক পশলা বৃষ্টির মতো শীতল, আবার কখনো তা দুপুরের তপ্ত মরুর মতো দহনজ্বালা নিয়ে হাজির হয়। রাজশাহী আমার জীবনের সেই দহনবেলার এক অমোঘ অধ্যায়। যে কিশোর একদিন এক বুক স্বপ্ন আর একরাশ ঘর-কাতুরে ভয় নিয়ে পদ্মা পাড়ের সেই শহরে পা রেখেছিল, সে আজ চব্বিশ বছর পর কলম হাতে নিয়ে ফিরে তাকালো নিজেরই ফেলে আসা ছায়ার দিকে।

খালাত ভাই রাশেদ—যে আমার ঘর ছাড়ার সেই বিষণ্ন দিনে ছায়ার মতো পাশে ছিল—সে একদিন আবদার করেছিল রাজশাহীর স্মৃতি নিয়ে একটি কবিতা লিখতে। কিন্তু রাশেদ হয়তো জানত না, আমার হৃদয়ের গোপন সিন্দুকে রাজশাহীর যে স্মৃতিরা জমা হয়ে আছে, তা কেবল গুটিকতক চরণে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। সেই জমানো দীর্ঘশ্বাস, অপমান আর যন্ত্রণার মেঘপুঞ্জ মিলে কখন যে একটি কবিতার সীমানা ছাড়িয়ে আস্ত এক উপন্যাসের রূপ নিল, তা আমি নিজেও টের পাইনি। রাশেদকে অশেষ ধন্যবাদ, তার সেই ছোট্ট 'উসকানি' ছাড়া হয়তো এই পাণ্ডুলিপি আলোর মুখ দেখত না।

এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় মিশে আছেন আমার বাবু মামা (রাজু আহমেদ বাবু)। তিনি আজ নেই, কিন্তু তাঁর শেখানো **'জলের মতো হওয়া'র** দর্শনেই আমি আজকের এই আমি হয়ে উঠেছি। আমার জীবনের কঠিনতম সেই দিনগুলোতে তিনি যদি আমার হাত না ধরতেন, তবে হয়তো বাস্তবতার এই রুক্ষ পথ চেনা আমার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হতো না। তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি রইল আমার গভীরতম শ্রদ্ধা।

পরিশেষে, আমার প্রিয় পাঠকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আপনারা আমার স্মৃতির এই অলিগলিতে সহযাত্রী হয়েছেন, আমার যন্ত্রণাকে নিজেদের ভাবনায় ঠাঁই দিয়েছেন। জীবন আসলে প্রাপ্তির চেয়ে অপ্রাপ্তির যোগফলই বেশি, আর সেই অপ্রাপ্তির গল্পগুলোই মানুষকে পূর্ণতা দেয়।

রাশেদ, বাবু মামা আর আপনারা—সবাই মিলে আমার এই স্মৃতির ধূসর শহরটিকে আজ রঙিন করে তুললেন। সবাইকে কৃতজ্ঞতা।



সেদিন স্কুল থেকে ফিরে বারান্দার দিকে তাকাতেই বুকের ভেতরটা এক চিলতে বিস্ময়ে ভরে গেল। প্রায় বছরখানেক বাদে বড় মামাকে দেখলাম। বারান্দায় আয়েশ করে চেয়ার পেতে বসে আছেন তিনি। আগের চেয়ে শরীরটা বেশ শুকিয়ে গেছে, তবে ওপরের দিকে আঁচড়ানো সেই সিগনেচার স্টাইলিশ চুলগুলো আজও অবিকল আগের মতোই আছে।

পেশায় আমার এই মামা একজন দর্জি কাম কাটিং মাস্টার। তবে তার যাপনচিত্রটা আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো নয়; কিছুটা ভবঘুরে ঘরানার। এই যাযাবর মানসিকতার কারণেই হয়তো কোনো এক নির্দিষ্ট জনপদে থিতু হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কাজের উসিলায় দেশভ্রমণ করাটাই যেন তার নেশা। তাই আমাদের এই চিরচেনা আঙিনায় বড় মামার দেখা পাওয়া ছিল অনেকটা কালেভদ্রেই পাওয়া কোনো অমূল্য মুহূর্তের মতো।

সময়টা ১৯৯৭ সাল। সবেমাত্র অষ্টম শ্রেণিতে পা রেখেছি। ঠিক সেই সময়েই আমাদের বসতভিটার ঠিকানাটা বদলে গেল। নানাবাড়ির এলাকাতেই ছোট মামার কাছ থেকে একখণ্ড জমি কিনে আমরা নতুন বাড়ি করলাম। তবে নতুন ঠিকানায় আসার বিপত্তিও ছিল—এখন প্রায় তিন-চার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে স্কুলে যেতে হয়। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে ছোট মামার কাছেই সাইকেল চালানোর দীক্ষা নিলাম। এখন প্যাডেল চেপে স্কুলে যাতায়াত করাটা অনেকটা সহজ ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে।

নওগাঁ শহরের কোল ঘেঁষা খিদিরপুর গ্রামে ছোট মামা এই জমিটুকু কিনেছিলেন মূলত এক বিশেষ উদ্দেশ্যে। ভাবনা ছিল এর অর্ধেক অংশ বড় ভাইয়ের কাছে বিক্রি করবেন এবং দুই ভাই মিলে এক আঙিনায় সংসার পাতবেন। কিন্তু বড় মামার ওই ভবঘুরে জীবনের কারণে শেষ পর্যন্ত আর জমি কেনা হয়ে ওঠেনি। তবে তিনি সেখানে নিজের জন্য একটি বসতঘর তুলেছিলেন। পরবর্তীতে বড় মামার সেই অংশটুকুই আমরা কিনে নিয়ে নিজেদের বসতি গড়ি।

যাহোক, সাইকেলটি উঠানের একপাশে স্ট্যান্ড করে আমি গুটিগুটি পায়ে বড় মামার কাছে গিয়ে সালাম দিলাম। তার পাশে যখন আড়ষ্ট হয়ে বসলাম, তখন মনের ভেতর এক অদ্ভুত জড়তা কাজ করছিল। আসলে বড় মামা—যাকে আমরা

বাবু মামা বলে ডাকি—আমাদের অসম্ভব স্নেহ করলেও খুব একটা দেখা না হওয়ার কারণে সেই মানসিক দূরত্বটুকু রয়েই গিয়েছিল।

কথার পিঠে কথা এল। কৌতূহলবশত আমি মামার বর্তমান অবস্থানের কথা জানতে চাইলাম। তিনি জানালেন এখন তিনি রাজশাহীতে কর্মরত। এরপর পরম মমতায় তিনি বর্ণনা করতে লাগলেন রাজশাহীর সেই মুগ্ধকর পদ্মা নদীর পাড়, ছোট ছোট চিড়িয়াখানা, ঐতিহাসিক টি-বাঁধ আর সেখানকার নজরকাড়া স্থাপত্য ও নিসর্গের কথা। তার বর্ণনায় পদ্মার পাড়ের সেই ছবি যেন আমার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠতে শুরু করল।

রাত বাড়ল। ডিনারে বসে ছোট বোন বিজলীর কাছ থেকে জানতে পারলাম এক অভাবনীয় সংবাদ—মামা আসলে আমাকে নিতেই এসেছেন।

ঘটনাটি খুলেই বলি। বড় মামা রাজশাহীতে যেখানে কাজ করেন, সেই দোকান মালিকের বড় ভাই এক নতুন ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট ব্যবসার চেম্বার খুলেছেন। সেখানে একজন টেলিফোন রিসিপশনিস্ট প্রয়োজন। মামা তার মালিকের ভাইয়ের সঙ্গে আমার ব্যাপারে সবিস্তারে কথা বলে রেখেছেন। শুধু কাজ নয়, তিনি নাকি আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও সব ধরনের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, চেম্বারের কাজ শুরু হয় বিকেলের পর থেকে এবং চলে রাত নয়টা কি দশটা পর্যন্ত।

ভালো বেতনের হাতছানি, তার ওপর পড়াশোনার অবারিত সুযোগ—এমন প্রস্তাব শুনে বাবা প্রথমে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে 'না' বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু মামার জোরালো আশ্বাস এবং আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত তার মন গলল। বাবা সম্মতি দিলেন।
কথাটা কানে আসা মাত্রই আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম! বিস্ময় আর আশঙ্কায় আমার গলা দিয়ে আর ভাত নামছিল না। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মায়ের দিকে তাকালাম; দেখলাম মা-ও অশ্রুসজল নয়নে আমার দিকেই চেয়ে আছেন। কোনো রকমে খাওয়া শেষ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম, কিন্তু চোখের পাতা কিছুতেই এক করতে পারলাম না। ঘুমের বদলে রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে ভিড় করল মাথায়।

যে আমি কোনোদিন নিজের বাড়ি ছেড়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতেও এক রাত কাটাইনি, যে আমি আজও রাতে অন্ধকারের ভয়ে প্রস্রাব করতে গেলে মাকে সঙ্গে নিয়ে বের হই—সেই আমি কীভাবে খেলার সাথী, প্রিয় বাবা-মা আর স্কুলের বন্ধুদের ছেড়ে অজানা-অচেনা এক শহরে একা থাকব? এই চিন্তাগুলো শরতের মেঘের মতো বিশাল আকৃতি ধারণ করে আমার মাথায় চেপে বসল। অঝোর ধারায় বালিশ ভিজিয়ে ফেললাম, বুক ফেটে বারবার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে লাগল। আহারে! কাল থেকে বুঝি আর তুলসী গঙ্গার তীরে ছোট বোনকে সাথে নিয়ে মাছ ধরা হবে না! কাল থেকেই কি তবে কানামাছি ভোঁ ভোঁ, দাঁড়িয়েবান্ধা আর ডাংগুলির সাথে আমার আড়ি হয়ে যাবে? সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে মোটরসাইকেলের সেই পুরনো টায়ারটির সাথে, যাকে একটি ছোট্ট লাঠির আঘাতে সারাদিন পুরো গ্রাম জুড়ে দৌড়িয়ে বেড়াতাম? এমনকি আমার সাধের সাইকেলটিতে চড়াও বুঝি চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে!

বড় মামা তিন দিনের ছুটিতে এসেছিলেন, তাই হাতে মোটে দিন দুয়েক সময় পেলাম। পরদিন স্কুলে গিয়ে সব বন্ধুদের এই বিদায়ের সংবাদটা জানালাম। প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আমরা একনাগাড়ে এই স্কুলেই একসাথে বড় হয়েছি। সেদিনই ছিল তাদের সাথে আমার শেষ দেখা। আমার প্রাণের বন্ধু আজাদ, শাওন, কাজল, নীরব, ইব্রাহিম খলিলসহ অনেককেই আমি সেদিন চোখের জলে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

(অবশ্য প্রযুক্তির কল্যাণে আজ এত বছর বাদে আবারও সেই কলিজার টুকরো বন্ধুদের ফিরে পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।)
স্কুল থেকে ফিরে আমার দীর্ঘদিনের জমানো 'রাজকীয় সম্পদ'গুলো একে একে বিলিয়ে দিতে শুরু করলাম। যেন নিজের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অন্যের মাঝে বণ্টন করে আমি কোনো এক দূর দেশে নির্বাসনে যাচ্ছি! সাধের মোটরসাইকেলের টায়ারটি দিলাম খালাতো ভাই রাশেদকে। অতি যত্নে সংগ্রহ করা চলচ্চিত্র তারকাদের ছবি সংবলিত অ্যালবামটি গচ্ছিত রাখলাম ছোট খালার জিম্মায়। আর আমার নিত্যদিনের সঙ্গী সেই সত্তরটির মতো বিচিত্র রঙের মার্বেল—তা দিয়ে দিলাম বোন বিজলীকে। এভাবেই টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে রিক্ত করতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে মামার ছুটি ফুরিয়ে এল। দিনটি ছিল শনিবার। আমি একরাশ বিষণ্ণতা নিয়ে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হলাম। সকালে গোসল সেরে খেয়ে নিতেই দেখলাম মা ব্যাগ গুছিয়ে দিয়েছেন। আমাকে বিদায় দিতে গ্রামের প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব আর মুরুব্বীরা উঠানে এসে ভিড় করেছেন। এই প্রথম ঘর ছাড়ছি, তাই আবেগকে আর বাঁধ দিয়ে রাখতে পারলাম না। দুচোখ গড়িয়ে শ্রাবণের ধারার মতো অশ্রু নামতে শুরু করল।

মা আমাকে মামার হাতে সঁপে দেওয়ার সময় ধরা গলায় বললেন, "বাবু আমার একটা মাত্র ছেলে, ওকে একটু দেখে রাখিস..."। তিনি আর কথা শেষ করতে পারলেন না। বুক ফাটা আর্তনাদে গলাকাটা মুরগির মতো ছটফট করতে করতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। আমিও কান্নায় ভেঙে পড়লাম। আমার সেই কান্না ছিল অনেকটা বিদায়বেলায় কোনো নববধূর কান্নার মতো করুণ।

আশেপাশের প্রতিবেশী আর স্বজনরা যে যার মতো সান্ত্বনা দিতে থাকলেন। মামা কখনো ধমক দিয়ে, কখনো বা ভরসা দিয়ে মাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, "আমি তো আছিই, ও তো আমার সাথেই থাকবে। আমরা তো একসঙ্গেই ঘুমাব, কিসের এত ভয়!"

প্রতিবেশী মহিলারা মাকে ধরে সামলাচ্ছিলেন। আমি মামার হাত ধরে ধীর পায়ে সামনে এগোতে লাগলাম আর বারবার পিছু ফিরে তাকাচ্ছিলাম। অঝোর ধারায় কান্নার কারণে সামনের রাস্তা ঝাপসা হয়ে আসছিল। বারবার মনে হচ্ছিল, এক দৌড়ে গিয়ে মায়ের আঁচল ধরি, শক্ত করে তাকে জড়িয়ে ধরি—যাতে এই ঘর ছেড়ে আমায় যেতে না হয়।

অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজনের বাঁকা কথা কানে এল। তারা সমালোচনা করে বলছিল, "ছেলে মানুষ নাকি রে! চাকরি করতে যাচ্ছে, এ তো খুশির কথা। পুরুষ মানুষকে তো আজ হোক বা কাল ঘর থেকে বের হতেই হয়, এত কান্নাকাটির কী আছে!" কিন্তু আমার বুকের ভেতর তখন যে হাহাকার চলছিল, তা বুঝিয়ে বলার ভাষা কিংবা সাধ্য—কোনোটিই সেদিন আমার ছিল না।

স্মৃতিগুলো আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেদিন আমাদের বিদায় দিতে গ্রামের অন্তত ২৫-৩০ জন মানুষ দল বেঁধে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল।

এক গ্রামের ছেলের পরবাসে যাত্রা যেন পুরো গ্রামেরই এক বিচ্ছেদের সুর হয়ে বেজেছিল। বাবা আমাদের সাথে বালুডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এলেন। বেলা দশটার বাসে আমাদের সিট বুকিং দেওয়া ছিল। ইঞ্জিন স্টার্ট নিতেই বাসটি দ্রুতগতিতে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে ছুটতে শুরু করল। ফেলে আসা চেনা জনপদ আর প্রিয় মুখগুলো জানালার ওপাশে মিলিয়ে যাচ্ছে—এ দৃশ্য দেখে আমার বুক ফেটে কান্না আসছিল। মনে আছে, বাস যখন 'মান্দা ফেরিঘাট' পার হচ্ছিল, তখনও আমি অবুঝের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম!

পথের ক্লান্তি আর বিচ্ছেদের বেদনা নিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। সাভাই নামক স্থানে পৌঁছানোর পর আমাদের বাস পরিবর্তন করতে হলো। সেখান থেকে মোহনপুর পার হয়ে রাজশাহীর সীমানায় প্রবেশ করলাম। 'রাজশাহী সিল্ক' নামক বিখ্যাত ফ্যাক্টরিটির পাশ দিয়ে যখন বাসটি শোঁ শোঁ করে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতা আমার চোখে ধরা দিচ্ছিল। অবশেষে আমরা 'রেলগেট' নামক স্থানে বাস থেকে নামলাম।

রেলগেট থেকে একটি রিকশা ভাড়া করে লক্ষ্মীপুর হয়ে যখন আমাদের গন্তব্যস্থল—অর্থাৎ 'হড়গ্রাম, কোর্ট স্টেশন রোড'-এ পৌঁছালাম, তখন ঘড়ির কাঁটায় বিকেল চারটা। এক নতুন শহর, নতুন আকাশ আর একরাশ অজানা ভবিষ্যৎ সামনে নিয়ে আমি আমার গন্তব্যে পা রাখলাম।



সামনে-পেছনে ছয়টি দোকান নিয়ে গড়ে ওঠা এক নবনির্মিত মার্কেট। মামা আমাকে সেই মার্কেটের একদম পেছনের ঘরটিতে নিয়ে গেলেন। সেখানে থাকা কয়েকজনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি। ঘরটির চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সেলাই মেশিন আর দর্জির কারুকার্য দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে, এটি একটি টেইলার্সের কারখানা। ঘরের এক কোণে বালিশ-কাঁথার স্তূপ আর অন্য কোণে কেরোসিনের স্টোভ ও কয়েকটি অ্যালুমিনিয়ামের পাতিল দেখে নিশ্চিত হলাম—কাজের জায়গার পাশাপাশি এটি হয়ত কারও থাকার আস্তানা।

সেখানেই নয়ন নামে আমারই বয়সী এক কিশোরের সাথে পরিচয় হলো। কথায় কথায় জানলাম, নয়ন মামার শ্বশুরবাড়ির দিককার শ্যালক; সেও এখানে দর্জির কাজ শিখতে এসেছে। আরও একজনকে দেখলাম, তিনিও মামার কোনো এক আত্মীয়। তারা আমাকে বেশ উষ্ণভাবেই বরণ করে নিল। তবে নয়নের কাছ থেকেই জানতে পারলাম, আজ থেকে এই কারখানার ছোট ঘরটিই হতে যাচ্ছে আমার ঠিকানা; যেখানে আমি হবো চতুর্থ সদস্য।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে আমি ঘরটির চারপাশ দেখছিলাম। কোনো জানালা নেই, নেই কোনো ভেন্টিলেশন—কেবল সামনের লোহার শাটারই বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। এমন রুদ্ধশ্বাস পরিবেশে মানুষ কীভাবে দিনরাত কাটিয়ে দেয়, ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিলাম না। মাথার ওপর একটি সিলিং ফ্যান ঝুলছে ঠিকই, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ের অছিলায় সেটি চালানোও নাকি বারণ!

মামা সংক্ষেপে আমাকে এলাকার প্রেক্ষাপট বুঝিয়ে বললেন। হড়গ্রামের এই অঞ্চলে হাকিম মিয়া নামের এক প্রভাবশালী বৃদ্ধের বসবাস। এককালে তার বিশাল 'স-মিল' বা কাঠের কলের ব্যবসা ছিল, যার নামানুসারে আজও এই এলাকাকে অনেকে 'হাকিম মিয়ার স-মিল' বলে চেনেন। এই মার্কেটটিও তারই তৈরি। হাকিম মিয়ার চার সুযোগ্য পুত্র। বড় ছেলে আব্দুল হালিম সাহেব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের একজন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা, যিনি তখন নওগাঁ খাদ্য গুদামে কর্মরত ছিলেন।
মেজ ছেলে মো. হাবিবুর রহমান—উত্তরাঞ্চলের সেনাবাহিনী ও সরকারি নানা স্থাপনা নির্মাণের একজন নামকরা ঠিকাদার। এই হাবিবুর রহমান সাহেবই তার

ঠিকাদারি ব্যবসার প্রসারে এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের একটি নতুন চেম্বার খুলতে যাচ্ছেন। আর সেই চেম্বারের টেলিফোন রিসিপশনিস্ট হিসেবেই আমার এই সুদূর রাজশাহী যাত্রা।

সেজ ছেলের নাম হাসান, তিনিও ব্যবসায়িক কাজে যুক্ত থাকলেও তাকে বেশির ভাগ সময় বাসাতেই দেখা যেত। আর কনিষ্ঠ পুত্র পিন্টু—যিনি এক সময় বাবার ওপর অভিমান করে ঢাকা গিয়ে গার্মেন্টসে চাকরি করেছিলেন। সেখানে ভালোবেসে এক গার্মেন্টস কর্মীকে বিয়ে করে ফিরে আসেন এবং বাবার কাছ থেকে মার্কেটের পূর্ব পাশের তিনটি দোকান বুঝে নেন। এর মধ্যে প্রথম দুটি দোকান মিলিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন 'সোনিয়া টেইলার্স এন্ড গার্মেন্টস'। আমার মামা মো. রাজু আহমেদ বাবু এই পিন্টু সাহেবের অধীনেই কাটিং মাস্টার হিসেবে কর্মরত।

মার্কেটের পশ্চিম পাশের তিনটি দোকান বরাদ্দ ছিল মেজ ভাই হাবিবুর রহমানের নামে। তিনি সামনের দুটি দোকানকে সুসজ্জিত চেম্বারে রূপান্তরিত করেছেন, আর পেছনের ঘরটি গুদাম হিসেবে ব্যবহারের জন্য ফাঁকা রেখেছেন। যেহেতু পূর্ব পাশের তৃতীয় দোকানের নির্মাণকাজ তখনো শেষ হয়নি, তাই পিন্টু সাহেব তার মেজ ভাইয়ের সম্মতিতে পশ্চিমের এই গুদামঘরটিকেই সাময়িকভাবে টেইলার্সের কারখানা হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। এভাবেই শুরু হলো আমার এক নতুন জীবনের অধ্যায়।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমার ডাক পড়ল। মামা আমাকে গুদামঘর থেকে ডেকে নিয়ে বারান্দা দিয়ে রাস্তার পাশে 'সোনিয়া টেইলার্স'-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন। সামনেই পূর্ব দিকে সবুজ ঘাসে ঢাকা এক চিলতে মাঠ। সেখানে গোল হয়ে কয়েকজন লোক আড্ডা দিচ্ছিলেন। মামা আঙুল উঁচিয়ে ওনাদের দেখিয়ে আমাকে বললেন, "বিপুল, ওই যে মাঝখানে সাদা শার্ট পরা স্বাস্থ্যবান লোকটি বসে আছেন, তিনিই হাবিবুর রহমান সাহেব। আজ থেকে তুমি ওনাকেই তোমার অভিভাবক মানবে। ওনার কাছে গিয়ে সুন্দর করে পরিচয় দাও, কিন্তু শুরুতে সালাম দিতে ভুলো না যেন..."
মামার সেই 'তুমি' সম্বোধনের আশ্বাসে নিজের জড়তা আর ভয়টুকু যতটা সম্ভব আড়াল করলাম। দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বুক ফুলিয়ে ওনাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং যথারীতি বিনয়ের সাথে লম্বা একটি সালাম দিলাম।

সালাম দেওয়া মাত্রই আসরে বসা সবাই হঠাৎ কেন জানি হো হো করে হেসে উঠলেন। একজন তো বলেই বসলেন, "এ তো দেখছি যা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও বেশি আনাড়ি!" আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবছিলাম—ভুলটা ঠিক কোথায় করলাম?

আমার হবু মনিব হাবিবুর রহমান সাহেব এবার মুখ খুললেন। জিজ্ঞেস করলেন, "নাম কী তোর?"
ভয়ে তখন আমার গলা প্রায় রুদ্ধ। আমি কিছুটা অস্পষ্ট স্বরে আমতা আমতা করে বললাম, "বি... বিপুল।"
সভাস্থলে দ্বিতীয় দফায় হাসির লহর উঠল।

উপহাসের হাসি কানে না নিয়ে আমি হাবিবুর রহমান সাহেবকে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা এবং ঈষৎ কোঁকড়ানো। গোলগাল ফরসা মুখে ক্লিন শেভ করা; পোশাকে আর চেহারায় যেন এক রাজকীয় জৌলুশ উপচে পড়ছে। পঁয়তাল্লিশোর্ধ্ব এই সুপুরুষটি কথা বলার সময় বুঝলাম তিনি সামান্য তোতলা।

হাবিবুর রহমান সাহেব সম্ভবত আমার মানসিক অবস্থা টের পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে সহজ করার জন্য আমার পরিবার, পড়াশোনা আর গ্রাম নিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। ওনার আন্তরিকতায় আমি ধীরে ধীরে জড়তা কাটিয়ে উঠলাম এবং বিনীতভাবে সেই পুরোনো আরজি পেশ করলাম—পড়াশোনার যে সুযোগের কথা বলে আমাকে এখানে আনা হয়েছে, তা যেন বজায় রাখা হয়।

একপর্যায়ে তিনি কৌতুক করে বললেন, "বিপুল, তোকে কিছু টাকা দিলে তুই কি আমাদের কলা কিনে এনে খাওয়াতে পারবি?"
ততক্ষণে আমি অনেকটা ধাতস্থ হয়েছি। আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ পারব। এ আর এমন কী কঠিন কাজ!"
আমার উত্তর শুনে তিনি বললেন, "তাই নাকি? আচ্ছা বল তো দেখি, কলা কত প্রকার?"
আমি খুব সাবলীলভাবে বললাম, "কেন, তিন প্রকার! যেমন—আইটা কলা, আনাজি কলা আর মানিক কলা।"

আমার কথা শুনে তিনি যেন অবাক হওয়ার ভান করলেন। বললেন, "হয়ে গেল? কলা মাত্র তিন প্রকার? এবার আমার কাছ থেকে শোন কলা কত প্রজাতির হয়।"

উপস্থিত সকলে উৎসুক চোখে ওনার দিকে তাকালাম। এবার তিনি যেন কলার এক সচিত্র বিশ্বকোষ খুলে বসলেন। একাধারে বলতে লাগলেন—সবরি, অমৃতসাগর, অগ্নিশ্বর, দুধসাগর, দুধসর, চন্দন, কবরী, জাব কাঁঠালি, চম্পা, চিনি চম্পা, সাগর, বেহুলা, মন্দিরা, বিয়ের বাতি, চোয়ালপাউশসহ আরও প্রায় বিশ-ত্রিশ প্রজাতির নাম! ওনার সেই অসাধারণ তথ্যভাণ্ডার দেখে আমরা সবাই বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে রইলাম। আমার ধারণা ছিল, ওনার বন্ধুরাও বোধহয় কোনোদিন এত কলার নাম শোনেননি।

আমি তখন মনে মনে ভাবছিলাম—টাকার অভাবে কোনোদিন ভালো শিক্ষকের কাছে পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। এমন একজন শিক্ষিত মানুষের ছায়াতলে যদি থাকতে পারি এবং তিনি যদি মাঝে মাঝে আমার পড়াগুলো একটু দেখিয়ে দেন, তবে তো আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল!

সেদিন রাত সাড়ে নয়টা অবধি ওনাদের আড্ডা চলল। এর মধ্যে আমি দুইবার পাশের দোকান থেকে চা এনে ওনাদের আপ্যায়ন করলাম। আড্ডা শেষে ওনারা যখন উঠলেন, তখন মামার সাথে পাশের কোর্ট স্টেশন এলাকার এক হোটেল থেকে রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। এরপর সেই গুদামঘরের রুদ্ধদ্বার কক্ষে ফিরে ঘুমের দেশে তলিয়ে গেলাম। এক নতুন শহরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে শুরু হলো আমার রাজশাহীর প্রথম রাত।